যুগান্তর

তারিখ 28 MAR 2008

লুটপাটের আয়োজন

রিএম জাহাঙ্গীর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার কর্মসূচির ১২০ কোটি টাকা জলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। অর্থবছর শেষে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের অনকূলে বরাদ্দ ছাড় করে কোটি কোটি টাকা লুটপাটের আয়োজন চলছে। অর্থবছরের মাত্র ৩ মাস বাকি থাকলেও এখনও ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া সম্ভব হয়নি। উপরন্তু নতুন করে ১৫ কোটি টাকার কর্মসূচি চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট অনেকে জানিয়েছেন, কাজ না করে ভুয়া বিলের মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেয়ার জন্য মহল বিশেষের ইন্ধনে এ অন্যায় তৎপরতা চলছে।

এদিকে নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পে নকশার পরিবর্তন ঘটিয়ে শতাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঊর্ধ্বমুখী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। গড়ে ৮০ ভাগ কাজ শেষ করার পর এখন বিধিবহির্ভূত এ কাজ ভায়েজ করার অনুমোদন চেয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও সংস্কার করার জন্য প্রতি বছর রাজস্ব বাজেট থেকে টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। প্রকল্প গ্রহণ ছাড়াই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুত করে অনুমোদিত কর্মসূচির মাধ্যমে কাজ করা হয়। বাস্তবে সংস্কার কর্মসূচির এ টাকার বেশিরভাগ অনিয়ম-দুর্নীতি ও কমিশন ভাগাভাগির মাধ্যমে ড্রেনআউট হয়ে যায়। চলতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৯০ কোটি টাকা। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় সিডর-পরবর্তী পুনর্বাসন প্রকল্পে ব্যয় করার জন্য এ খাত থেকে ৩৫ কোটি টাকা কেটে নেয়া হয়। অবশিষ্ট থেকে কিন্তু বাড়িয়ে ৮০ কোটি টাকার কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। এদিকে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর অর্থবছরের শুরুতে ৭৪২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও সংস্কারের তালিকা তৈরি করে কর্মসূচি অনুমোদনের প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেয়। এতে সরকারি স্কুল ৩১৭টি, কলেজ ২৫১টি, মাদ্রাসা ৪টি, কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট ১৬টি, টিচার ট্রেনিং কলেজ ১৯টি, টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট ৯৮টি এবং পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, লেদার কলেজ, টেক্সটাইল কলেজসহ মোট ৭৪২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার করার তালিকা প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কর্মসূচি অনুমোদন হয়ে আসতে ৭ মাস পার হয়ে যায়। গত ৫ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচির বিপরীতে অর্থ বরাদ্দ হয়ে আসার পর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়া শুরু করে। নিয়মানুযায়ী দরপত্র প্রকাশের দিন থেকে ওয়ার্ক অর্ডার দিতে ৭০ দিন সময় ব্যয় হয়ে যায়। বেশি তড়িঘড়ি করলেও পিপিআর অনুযায়ী তা ৫৫ দিনের আগে শেষ করার নিয়ম নেই। এ অবস্থায় এখনও ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া সম্ভব হয়নি। সূত্র জানিয়েছে, আগামী ১৫ এপ্রিলের আগে কোন অবস্থাতে ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া সম্ভব হবে না। ফলে কাজ করতে হাতে সময় থাকবে মাত্র দু'মাস। এ সময়ে ২৫ ভাগ কাজ করাও সম্ভব নয়। এছাড়া সংস্কারের নামে বরাদ্দ পাওয়া টাকার বেশিরভাগ দিয়ে বিধিবহির্ভূতভাবে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। এর পেছনেও নানারকম তদ্বির ও স্বজনপ্রীতি কাজ করে।

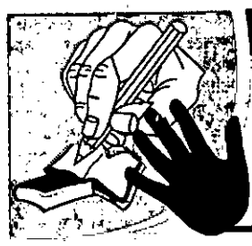

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর ৭৪২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও সংস্কারের তালিকা তৈরি করে কর্মসূচি অনুমোদনের প্রস্তাব দেয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার কর্মসূচির টাকা নিয়ে বাস্তব অবস্থা যখন এরকম, তখন নতুন করে কর্মসূচি

আয়োজন : লুটপাটের

(১ম পৃষ্ঠার পর) টাকা থেকে এখন ১৫ কোটি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সংস্কার কর্মসূচি সম্প্রসারণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় খবরটি মহল বিশেষের জন্য শাপে বর হলেও ৩০ জুনের মধ্যে কাজ উঠিয়ে নেয়া নিয়ে কেউ কেউ রয়েছেন বিপাকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, টাকা যাতে ফেরত না যায়, সেজন্য ভুয়া কাজ দেখিয়ে কিছু টাকা তো আগাম বিল করে রিলিজ করতেই হবে। রেওয়াজ অনুযায়ী এ টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার, এজি অফিস, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর এবং মন্ত্রণালয়ের মহল বিশেষের মধ্যে নীরবে ভাগাভাগিও হয়ে যাবে। কিন্তু এখন আবারও টাকা ছাড় করে বর্ধিত কর্মসূচি নিতে হলে জরুরি অবস্থার মধ্যে এত ভুয়া বিল কীভাবে করা যাবে? এ নিয়ে তারা টেনশনে রয়েছেন। তিনি জানান, মন্ত্রণালয় থেকে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা ধরিয়ে দিয়ে নতুন করে এখন কর্মসূচি নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। আবার ১৫ কোটি টাকা ছাড় দেয়া হলেও বাস্তবে কর্মসূচি নেয়া হচ্ছে ৪০ কোটি টাকার। মন্ত্রণালয়ের চাপের মুখে ইতিমধ্যে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকাও মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। আবার এ তালিকায় ফরিদপুর, দিনাজপুর, চাঁদপুর, বাগেরহাট ও ঝিনাইদহ জেলায় কোন কর্মসূচি নেয়া হয়নি। তদ্বিরের কারণে ঢাকা, রাজশাহীসহ কিছু কিছু জেলায় অপ্রয়োজনীয় কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাবিত নতুন কর্মসূচির টাকা অনুমোদন হয়ে আসতে এপ্রিল মাস লেগে যাবে। ওই অবস্থায় তড়িঘড়ি করে দরপত্র আহ্বান করে কাজ শুরু করতে চাইলেও ২৫ জুনের আগে ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া সম্ভব হবে না। ফলে অর্থবছরের মাত্র ৫ দিনে এ কর্মসূচির ১ ভাগ কাজও করা যাবে না।

সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায় থেকে সাফ বলে দেয়া হয়েছে, ৩০ জুনের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। আবার কোন টাকা ফেরত দেয়া চলবে না। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এ সংক্রান্ত এক বৈঠকে নতুন কর্মসূচি নিতে বাধ্য করা হয়। এ অবস্থায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের একশ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা নিয়ে মহাসংকটে পড়েছেন। কেউ কেউ আবার পুরনো অভ্যাস অনুযায়ী ভুয়া বিল দেখিয়ে পুরো টাকা খরচ দেখিয়ে দিতেও একপা বাড়িয়ে রয়েছেন।

এদিকে কাজ বাস্তবায়ন করা নিয়ে আরও জটিলতা অপেক্ষা করছে। সংস্কার কর্মসূচির কথা বলা হলেও যেহেতু বেশিরভাগ টাকা দিয়ে নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে সেক্ষেত্রে ঠিকাদারদের রড এবং ইট কেনার প্রশ্ন রয়েছে। বর্তমানে সরকারি কাজ করানো হচ্ছে ২০০৬ সালের দর দিয়ে। কিন্তু ইতিমধ্যে রড ও ইটের দাম বহুগুণ বেড়ে যাওয়ায় কোন ঠিকাদার লোকসানের আশংকায় পুরনো দর দিয়ে এখন কাজ করতে চাইছেন না। এ কারণে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, সংস্কার কর্মসূচির কাজ এ অর্থবছরে ১০ ভাগও হবে না।

জানা গেছে, সংস্কার কর্মসূচির টাকা বরাদ্দ নিয়েও বৈষম্য করা হয়েছে। কোন কোন জেলায় অস্বাভাবিকভাবে বরাদ্দ দেয়া হলেও কোন জেলা পেয়েছে যৎসামান্য। নানা রকম তদ্বিরে ঢাকা জেলায় ৮০ কোটি টাকা থেকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের ৪০ কোটি টাকা থেকে দেয়া হয়েছে আরও ১৩ কোটি টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে তার নিজের এলাকা রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে দেয়া হয়েছে ২ কোটি টাকা।

এদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৫২০ কোটি টাকা ব্যয়ে অপর একটি প্রকল্পেও বড় ধরনের অনিয়ম করা হয়েছে। ৩১৭টি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ২,৪২৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩ তলা ভিতসহ ১ তলা ভবন নির্মাণের প্রকল্পটি ১৯৯৭ সালে শুরু হয়। আগামী ৩০ জুন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে। কিন্তু জায়গার অভাবে প্রকল্পের নকশার ব্যত্যয় ঘটিয়ে শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ না করে বিদ্যমান ভবনের উপরের দিকে নির্মাণ কাজ করা হয়েছে। সম্প্রতি ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের নির্মাণ কাজের অনুমোদন চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। অথচ অনুমোদন দেয়ার আগেই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে গড়ে ৮০ ভাগ কাজ শেষ হয়ে গেছে।

মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, যখন স্কুলগুলোর বিপরীতে প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়েছিল তখন প্রয়োজনীয় জায়গা থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত তথ্য নথিতে আছে। এ অবস্থায় এখন কোন প্রতিষ্ঠানে জায়গা না থাকলে কাজ হবে না। টাকা ফেরত যাবে। কিন্তু পিপিবহির্ভূতভাবে ঊর্ধ্বমুখী ভবন নির্মাণের সুযোগ নেই। তারা মনে করেন, পিপিতে প্রতিটি স্কুলের জন্য ২৯ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া আছে। যার বেশিরভাগ টাকা ব্যয় হবে ৩ তলা ভিত করার কাজে। এখন ভিত না করে উপরের দিকে ভবন নির্মাণ করলে ব্যয়ও অনেক কমে যাবে। এক্ষেত্রে আর্থিক ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দেবে। বিশেষ করে বেশিরভাগ নির্মাণ কাজ শেষ করে অনুমোদন চাওয়ার যৌক্তিকতা নেই। তারা বলেন, প্রকল্পের এ অনিয়ম নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। তদন্ত হলে বড় ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত হবে।